গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা | ১৫ - ২১ জুলাই ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

জনগণকে নিংড়ে নিচ্ছে বিজেপি সরকার

রান্নার গ্যাসের দাম আবারও বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৭ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,

প্রতিটি রান্নাঘরকে ধোঁয়ামুক্ত করার যে প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছিলেন বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সরকারই তাকে প্রহসনে পরিণত করে রান্নার গ্যাসের দাম আবারও ৫০ টাকা বাড়িয়ে দিল। এক সিলিন্ডার গ্যাসের দাম এখন দাঁড়াল ১০৭৯ টাকা। এই দামের বোঝা বহন করা আয় কমে যাওয়া ও চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত মানুষের সাধ্যের বাইরে। এই ঘটনা আবারও দেখাল যে, একটা ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী সরকার কীভাবে সরকারি ও বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলিকে সর্বোচ্চ মুনাফা পাইয়ে দিতে শ্রমজীবী জনগণের শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিংড়ে নেয়।

এর তীব্র প্রতিবাদ করে আমরা আবারও বলতে চাই, অবিরত এই অর্থনৈতিক আক্রমণ চলতেই থাকবে যদি না নিপীড়িত মানুষ একজোট হয়ে বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, লাগাতার ও সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফাই গ্যাসের অগ্নিমূল্যের কারণ

রান্নার গ্যাসের দাম এক-দু টাকা করে নয়, ৫০ টাকা করে বাড়ানো এখন রেওয়াজে পরিণত করেছে বিজেপি সরকার। গত মার্চ থেকে চার দফায় সরকার দাম বাড়াল ১৫০ টাকা। ফলে বর্তমানে দাম দাঁড়িয়েছে ১০৭৯ টাকা। এত দামে গ্যাস কেনা সমাজের বড় অংশের মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গ্যাস কিনতে না পারার জন্য উনুনে ফিরে যাওয়া বা গ্যাসের খরচ কমাতে গিয়ে দিনে দু'বেলা গরম ভাত খাওয়ার কথা ভুলে যাচ্ছে অনেকেই উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের বেশিরভাগেরই একসঙ্গে ১১০০ টাকা জোগাড় করার ক্ষমতা নেই। তাদের বেশির ভাগই গ্যাস কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা উজ্জ্বলা গ্যাসের সিলিন্ডার, ওভেনে 'ফর সেল' স্টিকার লাগিয়ে প্রতিবাদে পথে নেমেছেন।

মানুষ ক্ষুব্ধ হবে না কেন? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার সময়ে এক সিলিন্ডার গ্যাসের জন্য খরচ করতে হত ৪১০ টাকা। ১২৭০ টাকা নগদে কিনে ভরতুকি পাওয়া যেত ৮৬০ টাকা। এখন খরচ করতে হচ্ছে ১০৬০ টাকা (১৯.৫৭ টাকা ভরতুকি ধরে)। ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফারের স্বপ্ন দেখিয়ে জনগণকে বোকা বানিয়ে ভর্তুকির ক্যাশটাই প্রায় শূন্যে নামিয়ে আনা হল। সবার মনে আছে গ্যাস সংযোগের সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যোগ

সাতের পাতায় দেখুন

২০২১-'২২
তেল কোম্পানিগুলির মুনাফা (টাকায়)

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ	- ৬৭ হাজার ৮৪৫ কোটি
ওএনজিসি	- ৪০ হাজার ৩০৫ কোটি
ইন্ডিয়ান অয়েল	- ২৪ হাজার ১৮৪ কোটি
পেট্রোনেট এলএনজি	- ৩৫৫২.৩৫ কোটি

অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড, এসার, কেয়ার্ন ইন্ডিয়া, টাটা পেট্রোডাইন, আদানি গোষ্ঠীর একাধিক তেল-গ্যাস কোম্পানি, গেইল, ভারত পেট্রোলিয়াম, হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি কোম্পানিও বিগত আর্থিক বছরে রেকর্ড লাভ করেছে।

(বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২৭ মে ২০২২, মানি কন্ট্রোল.কম ২৪ জুন ২০২২, এনার্জি ওয়ালর্ড. কম, ১৭ মে ২০২২)

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে দেশজোড়া বিক্ষোভ। ছবি ঃ কলকাতা। ৮ জুলাই

কলকাতায় বিশাল কর্মীসভা

৬ জুলাই কলকাতার নজরুল মঞ্চে বিশাল কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কর্মীদের করণীয়, বিপ্লবী হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার সংগ্রাম ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সর্বহারার মহান নেতা
এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উদযাপন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
পেয়ারেলাল ভবন অডিটোরিয়াম, দিল্লি
৫ আগস্ট ২০২২। বেলা ১১টা

বক্তা ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য পলিটবুরো সদস্য
সভাপতি ঃ কমরেড সত্যবান পলিটবুরো সদস্য

বর্ষব্যাপী নানা ভাবে উদযাপন চলবে

মেয়েদের কাজে ফেরানোর দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই

২০২১-এর পরিবার ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় সমীক্ষা অনুযায়ী, এই প্রথমবার ভারতে মহিলাদের সংখ্যা ছাপিয়ে গেল পুরুষের সংখ্যাকে। অথচ সরকারি সমীক্ষাই দেখাচ্ছে, দেশে মহিলা কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। এমনকি শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো ছোট দেশের তুলনাতেও ভারতে মহিলা-কর্মী কম।

ভারত এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ বলে অবিরাম প্রচারের ঢাক পেটান সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। এমন একটি দেশের কাজের বাজারে মহিলা-কর্মীর এই উদ্বেগজনক স্বল্পতা নিয়ে তাঁদের কিন্তু কোনও হেলদোল দেখা যাচ্ছে না। শিল্পপতিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-আমলাদের বাজেট-পরবর্তী বৈঠকে বিষয়টি আলোচনায় উঠে এলে কেন্দ্রীয় অর্থসচিব তাই, সমস্যার মূলে না গিয়ে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন কি না, এই প্রশ্ন তুলে দায় সেরেছেন।

একুশ শতকের এই আধুনিক যুগে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও সমান তালে উৎপাদনের কাজে এবং সমাজ গঠনে অংশ নেবে— এটাই হওয়া উচিত। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই এ দেশে মহিলা-কর্মীর সংখ্যা কমছে। এনএসএসও-র তথ্য অনুযায়ী, ২০০৪-'০৫-এ কাজ করতেন ৩৭ শতাংশ মহিলা। ২০১৬-তে সেই হার পৌঁছেছে ২৬ শতাংশে। গ্রাম-শহর, সংগঠিত-অসংগঠিত সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতেই মহিলা-কর্মীর সংখ্যা কমছে। স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত মেয়েদেরও মাত্র ৩২-৩৩ শতাংশই কর্মরত। কোভিড অতিমারি এই পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করেছে।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? যে দেশে গরিবি এত সর্বব্যাপক, সেখানে দুটো রোজগারের আশায় পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদেরও তো কাজের বাজারে আসার কথা! তা হচ্ছে না কেন? এর উত্তর অনেকটাই রয়েছে মেয়েদের প্রতি যথাযথ সমাজ-দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের মধ্যে। আজও ভারতীয় সমাজের একটা বড় অংশ মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক ভাবতেই অভ্যস্ত। পরিবারের পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে, আর্থিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে তাদের ওপরেই নির্ভর করে ঘরের চার-দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে নারী নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবে— সমাজ-মননের একটা বড় অংশ জুড়ে এই ধারণা আজও বহাল। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ আজও মনে করেন, গৃহকর্ম ও সন্তানপালনই নারীর প্রধান কাজ। একটি স্বাধীন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ভারত আত্মপ্রকাশ করেছে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে। তা সত্ত্বেও সামন্ততান্ত্রিক এই মনোভাব আজও টিকে থাকার পিছনে রয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভারতে সমাজবিপ্লবের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হওয়া। এই অবস্থায় ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসার সুযোগ করে নিতে পেরেছেন খুবই অল্পসংখ্যক মেয়ে। যাঁরা তা পেরেছেন, ভয়ানক বেকার সমস্যার এই যুগে আজ তাঁদেরও কাজের বিশেষ সুযোগ মিলছে না। এমনিতেই এ দেশে বেকার সমস্যা গত ৪৫ বছরের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। এর ওপর অতিমারি ও লকডাউনের কারণে কর্মহীনতা আরও বেড়েছে।

মেয়েদের কাজের জগতে না আসার আরও একটি কারণ, কর্মক্ষেত্রে ও রাস্তাঘাটে নিরাপত্তার অভাব। কাজের জায়গায় যৌন হেনস্তা রোখার জন্য আইন তৈরি হয়েছে ২০১৩ সালে। অথচ দেখা যাচ্ছে, আজও পর্যন্ত কোনও সরকারই সেই আইন মেনে কমিটি তৈরিতে কোনও সংস্থা-কর্তৃপক্ষকেই বাধ্য করেনি। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ৩৬ শতাংশ ভারতীয় ও ২৫ শতাংশ বহুজাতিক সংস্থা এমনকি অভিযোগ শোনার কমিটিটুকু পর্যন্ত তৈরি করেনি। অফিস ছাড়াও ট্রেনে-বাসে, রাস্তাঘাটে শুধু নারী হওয়ার কারণেই প্রতিনিয়তই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে বাধ্য হন মেয়েরা। তা সত্ত্বেও কাজের বাজারে যে মহিলারা আছেন, জীবিকার বাধ্যতায় হেনস্তার ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের অধিকাংশকে।

এ ছাড়া রয়েছে নারী-পুরুষে বেতনবৈষম্য। সমকাজে সমবেতনের আইনটি পাশ হয়েছে বহু দিন হল। কিন্তু এখনও, অসংগঠিত ক্ষেত্র তো বটেই, সংগঠিত ক্ষেত্রেও বহু জায়গায় পুরুষ কর্মীর তুলনায় মহিলা কর্মীরা কম বেতন পান। তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাঙ্ক-বিমা, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্র— সমস্ত জায়গাতেই রয়েছে নারী-পুরুষে বেতনবৈষম্য। এই বিষয়টিও কাজের জায়গায় বেশি করে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের নিরুৎসাহিত করছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মহিলা-কর্মীদের মজুরির পরিমাণ এতটাই কম যে, কাজ করার চেয়ে ঘরে থাকাই শ্রেয় মনে করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। কৃষিক্ষেত্রেও একই সমস্যা। সেখানে বহু সময় মহিলা-শ্রমিকদের ওপর নানা অমানবিক শর্ত চাপানো হয়। পরিণতিতে কাজ ছাড়তে বাধ্য হন মেয়েরা।

মহিলা-কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়ার পিছনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। এ দেশে সন্তানপালনের দায়িত্ব প্রধানত মায়েদের ওপরেই ন্যস্ত। শিশুসন্তানকে ঘরে রেখে কাজে যাওয়া খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকারগুলির উচিত ছিল কলে-কারখানায়, কাজের জায়গার কাছাকাছি এলাকায় শিশুদের দেখভালের জন্য ক্রেশের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এ দেশে ক্রেশের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই সন্তান জন্মের পর বহু মা-ই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাছাড়া, আইন থাকা সত্ত্বেও মহিলা-কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুযোগ-সুবিধাগুলি দিতে মালিকদের আপত্তি— খুবই সাধারণ ঘটনা। সন্তানের দেখভালের জন্য ছুটি চাইলে অনেক সময়ই মহিলা-কর্মীদের হাতে ছাঁটাইয়ের নোটিস ধরিয়ে দিতে দেখা যায় মালিকদের।

একুশ শতকে দাঁড়িয়ে ভারত যখন একদিকে প্রযুক্তিগত উন্নতিতে আকাশ ছুঁতে চাইছে, অন্যদিকে তখন সনাতন রীতিনীতি, অন্ধ ধর্মীয় চিন্তা ও কুসংস্কারের জালে আটকে-পড়া এ দেশের নারীদের একটা বড় অংশ আজও মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। সমীক্ষা বলছে, ভারতে প্রতি তিনজনে একজন মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সম্পূর্ণভাবে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করা বা মহিলা কমিশনের কাছে সাহায্য চাওয়ার সুযোগ থাকে না মহিলাদের। ফলে শারীরিক লাঞ্ছনা ও মানসিক যন্ত্রণা বহন করেই কোনও রকমে জীবন কাটায় ভারতের বিপুল সংখ্যক নারী। সমাজে নারীর অবমাননা প্রতিফলিত হয় তাদের প্রতি পুরুষের যৌন হিংসায়। নারীকে মানুষ নয়, শুধুমাত্র ভোগের বস্তু ভাবতে অভ্যস্ত এ দেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাই ক্রমেই বেড়ে চলেছে ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনা। পণ দিতে না পারায় খুনের ঘটনা অহরহ ঘটে। পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে ঘরের বাইরে পা রাখতে পেরেছেন নারীদের যে সামান্য অংশটি, এমনকি তাঁদেরও প্রতিনিয়ত সঙ্গী বা সহকর্মী পুরুষদের নানা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, অবমাননাকর আচরণের সামনে পড়তে হয়। একই সঙ্গে বাড়ছে নাবালিকা-বিবাহের সংখ্যা, যা রুখতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার সরকারগুলির।

এই পরিস্থিতি দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যত বেশি করে মহিলারা উৎপাদনের কাজে এগিয়ে আসার সুযোগ পাবেন, যত বেশি করে তাঁরা রাষ্ট্র-পরিচালনা সহ সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, ততই সমাজ-মননে তাঁদের ছোট করে দেখার, তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মানসিকতা দূর হবে। পাশাপাশি আর্থিক স্বনির্ভরতা নারীকে দেবে আত্মবিশ্বাস। বাড়িয়ে দেবে বাধার বিরুদ্ধে তার লড়াই করার ক্ষমতা। কুৎসিত পণপ্রথার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াবার জোর পাবে মেয়েরা। সমাজও নারীকে অবমানুষ নয়, পুরুষের সমকক্ষ মানুষের মর্যাদা দিতে শিখবে। বদল ঘটবে সমাজচেতনার। এতেই নিশ্চিত হবে নারীর সুরক্ষা। শুধু আইন করে এ জিনিস করা সম্ভব নয়। তাই সচেতনতার ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি প্রথম প্রয়োজন মেয়েদের রোজগারের পথ খুলে দেওয়া। শিক্ষার আঙিনায় আরও বেশি করে মেয়েদের টেনে আনার পাশাপাশি তাদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করা। এই কাজগুলি করার ক্ষেত্রে মেয়েদের সামনে যে সব বাধা আছে, সেগুলি দূর করার ব্যবস্থা করা।

একটি স্বাধীন দেশের সরকারেরই এ ব্যাপারে প্রধানত উদ্যোগী হওয়ার কথা। কিন্তু এ দেশে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলির কাউকেই সেই ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় না। কেন্দ্রে বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন বিজেপি সরকারের কাছ থেকে অবশ্য এই আশা করারও কোনও অর্থ হয় না। কারণ বিজেপি দলটির আদর্শগত অবস্থানটিই হল নারীসমাজের প্রগতির বিরোধী। প্রধানমন্ত্রী যতই 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর স্লোগান দিয়ে নারীদরদির ভেক ধরুন না কেন, তাঁর দলের আদর্শগত গুরু মোহন ভাগবত মেয়েদের গৃহবন্দি থাকারই নিদান দিয়েছেন। খাওয়া-পরা ও নিরাপত্তার বিনিময়ে স্ত্রী যদি স্বামীর মন যুগিয়ে চলতে না পারে, তাহলে তাকে ত্যাগ করার অধিকার স্বামীর রয়েছে বলেও মত প্রকাশ করেছেন তিনি। উগ্র হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ন বিজেপি-কর্তারা অহরহ ধর্ষণের মতো পৈশাচিক ঘটনার দায় চাপান মেয়েদের পোশাক-আসাকের ওপর। প্রগতির পরিপন্থী মানসিকতার কারণেই ২০১২ সালে নির্ভয়া কাণ্ডের পর নারী নিরাপত্তা আইনে পরিবর্তন আসা সত্ত্বেও, এবং নারী নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করার জন্য নির্ভয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলায় দলের ভগবানগোলা লোকাল কমিটি এবং এআইকেকেএমএস-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড লুৎফর রহমান ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জুন ভোরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

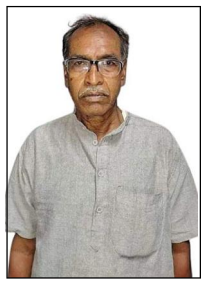

মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড লুৎফর রহমান শৈশবে মা-বাবাকে হারান। ছোট ভাই-বোনের দায়িত্বও তাঁকে কাঁধে তুলে নিতে হয়। ১৯৭১ সালে বেনামী ও খাসজমি উদ্ধার আন্দোলনের সময়ে তিনি এআইকেকেএমএস-এর সদস্য হন। পরে ভগবানগোলার এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড সাধন রায়ের মাধ্যমে দলের চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ১৯৭৪ সালে তিনি ভগবানগোলা থানা লোকাল কমিটির সদস্য হন। জীবনের শেষ চারটি বছর দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে ভগবানগোলা পার্টি অফিসে থেকেই তিনি কাজ করতেন। তাঁর শিশু-কিশোরদের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। গল্পের মাধ্যমে ছোটদের সঙ্গে তিনি অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন। দলের প্রতি আনুগত্য ও অমায়িক আচরণের কারণে তিনি সকলের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর প্রয়াণে গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষ এক সংগ্রামী সংগঠককে হারাল।

কমরেড লুৎফর রহমানের দেহ ভগবানগোলা অফিসে নিয়ে আসা হলে বিভিন্ন এলাকার কর্মী সহ ওই এলাকার শত শত সাধারণ মানুষ জড়ো হন। রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষালের পক্ষে যথাক্রমে জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায় ও জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড বকুল খন্দকার মরদেহে মাল্যদান করেন। জেলা অফিসের পক্ষে কমরেড অরূপ কুমার দাস সহ জেলা এবং আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ কর্মীরা মাল্যদান করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড লুৎফর রহমান লাল সেলাম

অসংগঠিত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনতার বিক্ষোভ আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারে না

শিবদাস ঘোষ

আগামী ৫ আগস্ট শুরু হচ্ছে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ। সারা দেশ জুড়ে শোষিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা উদযাপন করবেন। এই উপলক্ষে 'গণদাবী'র পক্ষ থেকে তাঁর মূল্যবান বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতার নানা অংশ প্রকাশ করা হবে। এই সংখ্যায় ১৯৭৪-এর ২৪ এপ্রিল পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবসে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে দেওয়া ভাষণের অংশবিশেষ প্রকাশ করা হল।

আপনারা লক্ষ করেছেন, গুজরাটে জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করার ফলে যে আন্দোলনে তারা ফেটে পড়ল, তা বেশি দূর এগোতে পারেনি। বিহারেও আন্দোলন আজ যে পথ গ্রহণ করেছে এবং সেখানে আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যকরীভাবে আজও যে শক্তিগুলোর হাতে রয়েছে, তার ফলে বিক্ষোভ, আত্মত্যাগ, গুলি খাওয়া, প্রাণ দেওয়া, সরকারি তরফ থেকে অত্যাচার, যত কিছুই যে পরিমাণে ঘটুক না কেন, এরও পরিণতি বেশিদূর নয়। যে কথাটা এর দ্বারা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি, তা হল এই যে, অত্যাচার যতদিন থাকবে এবং যখন তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে, মানুষ মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে নেতৃত্ব থাকুক আর না থাকুক, আদর্শ ঠিক থাকুক আর না থাকুক, রাস্তা ভুল হোক, পথ ভুল হোক, নেতৃত্ব ভুল হোক, লড়াইয়ের ময়দানে এসে যাবে। এই লড়াই হবে। লড়াই হচ্ছেও। আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কম রক্ত ঢালেনি। এ কথা যদি কেউ বলেন যে এ দেশের মানুষ লড়তে জানে না, এ দেশের মানুষ প্রাণ দিতে জানে না, এ দেশের মানুষ পুলিশের বন্দুক দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যায় এবং গর্তে লুকিয়ে থাকে, তা হলে আমি বলব, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তাঁরা এ দেশের ইতিহাস, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত যত আন্দোলন এ দেশে ঘটেছে, যত আত্মত্যাগ ও কোরবানি হয়েছে, যত অত্যাচার হয়েছে, যত লাঠি-গুলি চলেছে তার ইতিহাস হয় জানেন না, না হয় জেনে শুনে সেই ইতিহাস তাঁরা বিকৃত করছেন, অথবা তাঁরা সেই ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছেন। আমি আপনাদের বলছি, আবারও এ দেশের মানুষ লড়বে। আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিরাশা, হতাশা, অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাদের আস্থাহীনতা যাই থাকুক, তারা কোনও দলের নেতৃত্বকে পছন্দ করুক না করুক, বা এই সমস্ত রাজনৈতিক দল কিছু করতে পারবে না, এ রকম মনোভাবনা তাদের মধ্যে থাকলেও তারা বসে থাকতে পারবে না। কারণ, পেট বড় বালাই। অত্যাচার শোষণ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে তখন তারাও বোমার মতো ফেটে পড়তে বাধ্য হবে, আন্দোলন করতে বাধ্য হবে, মরবে এবং প্রাণ দেবে। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, এর দ্বারা ফল কিছু হবে না। কারণ বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যত ব্যাপকতা নিয়েই গড়ে উঠুক, অসংগঠিত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনতার শুধুমাত্র অ্যাজিটেশনাল ফর্ম অব মুভমেন্ট (বিক্ষোভের রূপে এই আন্দোলন) বেশি দূর পর্যন্ত এগোতে পারে না।

আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে আন্দোলনের যে কৌশল চলেছে, এ আন্দোলনের প্রকৃতিও সেইরকম, অর্থাৎ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে, সুষ্ঠু রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করে, সংগঠিত করে, সংগঠিত রূপে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা নয়। এর প্রকৃতি হচ্ছে, মানুষের মধ্যে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং লড়াইয়ের মনোভাব যখন দানা বাঁধতে থাকে, মানুষ কিছু একটা করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, তখন কিছু গরম ভাষণ দিয়ে তাদের উত্তেজিত করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া। তারা সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, আর নেতারা মাঝে মাঝে কিছু কিছু 'লড়াইয়ের কর্মসূচি' দিতে থাকেন। নেতাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না। বড় জোর একটা সরকার যদি অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, বিব্রত বোধ করতে থাকে, বা একটু আনওয়াইজ (বেকুব) হয়, তা হলে নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে 'আসুন স্যার'

৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

বলে জেলে পুরে দেয়। নেতাদের সেই জেলে যাওয়াটা একটা রাজনৈতিক ক্যাপিটাল (মূলধন) হয়। তাঁরা বেশ হাসতে হাসতে জেলে যান। গিয়ে সেখানে ডিভিশন ওয়ান প্রিজনার (প্রথম শ্রেণির বন্দি) হন, আর জেলে তাঁদের অ্যালাউয়েন্স আরও বেশি পাওয়া দরকার কি না তার জন্য লড়ালড়ি করেন। আবার দশ-পনেরো দিন বাদে গলায় মালা পরে বেশ মহাবীরের মতো বেরিয়ে আসেন এবং বেরিয়ে এসেই সরকারের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার দিতে থাকেন। আর নির্বাচন থাকলে তো কোনও কথাই নেই। তাঁরা বলতে থাকেন, এই সরকার কিছুই করেনি। আমরা লড়েছি, আমাদের ক্ষমতায় বসাও, সরকারি গদিতে বসাও। বসালেই একেবারে রামরাজত্ব আমরা কায়েম করে দেব। আন্দোলনের এই যে প্রকৃতি, এটাকেই আমি বলতে চেয়েছি, বুর্জোয়াদের অনুরূপ বুর্জোয়া ফর্ম অব অ্যাজিটেশনাল মুভমেন্ট (বুর্জোয়া কায়দায় বিক্ষোভ আন্দোলন)।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বুর্জোয়ারা ব্রিটিশবিরোধী জনতার আন্দোলনের প্রবণতাকে অসংগঠিত অবস্থায় রেখে বিচ্ছিন্নভাবে জনতাকে দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়িয়েছে এবং তার চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বারগেইন (দর কষাকষি) করতে চেয়েছে। আজও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা জনতার মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভকে শুধু উস্কানি দেয় এবং তাকে ভিত্তি করেই লড়াইয়ের ময়দানে জনতাকে নামিয়ে দেয়, আর তার ফলে পুলিশের অত্যাচারে, শাসনযন্ত্রের দমনপীড়নে স্বাভাবিকভাবেই সরকারবিরোধী, শাসকদলবিরোধী যে মনোভাব এবং ঘৃণা জনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তাকেই তারা মনে করে একটা পলিটিক্যাল গেইন (রাজনৈতিক লাভ)। এর দ্বারা বিপ্লব হোক বা না হোক, জনসাধারণের দুর্দশার জন্য দায়ী এই সমাজব্যবস্থার কোনও একটা আমূল পরিবর্তন হোক বা না-হোক, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু এর দ্বারা সরকার বা শাসকদলবিরোধী যে বিক্ষুব্ধ মনোভাব এবং ঘৃণা জনসাধারণের মধ্যে আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তাকে ভিত্তি করেই এই সমস্ত দলগুলি কেউ বিপ্লবের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা, কেউ জনসাধারণের জন্য কী করবে তার লম্বা ফিরিস্তি এবং জনসাধারণকে উজির-নাজির বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বড় বড় প্রতিজ্ঞা, ভাষণ, কর্মসূচি, এই সমস্ত দাখিল করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দিকে যায় এবং সরকার গঠনের চেষ্টা করে। আমি বলি, এই যে ভিসাস সার্কল (দুষ্ট চক্র), অর্থাৎ এই যে লড়াই বার বার দানা বাঁধছে, বিক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়ছে, আর যারা নির্বাচনী পার্টি তারা সেই বিক্ষোভ থেকে মওকা নিয়ে ইলেকশন রাজনীতিতে ফয়দা তুলছে— সেই দুষ্ট চক্র থেকে গণআন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের বেরিয়ে আসার পথ কী?

লড়াই বার বার দানা বাঁধছে, বিক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়ছে, আর যারা নির্বাচনী পার্টি তারা সেই বিক্ষোভ থেকে মওকা নিয়ে ইলেকশন রাজনীতিতে ফয়দা তুলছে— সেই দুষ্ট চক্র থেকে গণআন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনকে বের করে আনতে হবে।

আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, বিক্ষোভ যত বড়ই হোক, বিক্ষোভ আর বিপ্লব এক নয়। বিক্ষোভের দ্বারা আপনাআপনি বিপ্লব হয়ে যায় না। বিপ্লব মানে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যাকে আমরা বলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটির ধাঁচাটিকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা প্রবর্তন। তাকে আমরা বলি বিপ্লব। এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আপনাআপনি জন্ম নেয় না, ইতিহাস এ কথা বলে না, বিজ্ঞান এ কথা বলে না, এ ধারণা অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। এই ভাবে যারা বিক্ষোভকে বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারা হয় মূর্খ, আর না-হয় অত্যন্ত ধূর্ত, জাঁহাবাজ ইলেকশন রাজনীতিবিদ। তারা বিক্ষোভ আন্দোলনগুলিকেই, অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলিকেই একটু মারমুখী ঢং-এ পরিচালনা করে সেগুলিকেই 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চালিয়ে আসল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিকে বিপথগামী করে দেয় এবং এইভাবে বিপ্লবটাকে গড়তে দেয় না। বিপ্লবের পথে তারা এসে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বিক্ষোভ আর বিপ্লব এক নয়— এ কথা মনে রাখবেন। বিক্ষোভ এই পশ্চিমবাংলাতেই আজ না হলেও, আবার হবে, যেমন অতীতে হয়েছে। মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। কিন্তু, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, মার খেয়ে, সরকারবিরোধী হয়ে তারা আবার ইলেকশন রাজনীতির মধ্যে যাবে। পুঁজিবাদ যে জায়গায় ছিল, শোষণ যে জায়গায় ছিল, বেকার সমস্যা যে জায়গায় ছিল, শিক্ষার মান যে-ভাবে নিম্নগামী হচ্ছিল, নৈতিক মান যে-ভাবে দিনের পর দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল— এগুলো সবই থাকবে। এর কেশাগ্রও আপনারা স্পর্শ করতে পারবেন না। হাজার কোরবানি হলেও শুধুমাত্র বিক্ষোভের দ্বারা, কোরবানির দ্বারা, আত্মত্যাগের দ্বারাই আপনারা বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবেন না। এই বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে আপনাদের নির্দিষ্ট স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত হতে হবে— অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সচেতন সংঘবদ্ধ জনতার দীর্ঘস্থায়ী লড়াই পরিচালনার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মূল্য দিচ্ছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরা

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের আচরণে কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবারগুলি হাড়ে হাড়ে বুঝছেন কতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রচারসর্বস্ব এই সরকার। মাত্র কয়েকমাস আগেই পণ্ডিতদের জন্য চোখের জল ফেলার প্রতিযোগিতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে বিজেপির তাবড় কোনও নেতাই পিছিয়ে ছিলেন না। 'কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমা সকল ভারতবাসীকে দেখিয়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতি কর্তব্য পালনে তাঁরা একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। অথচ বাস্তবে কাশ্মীরি পণ্ডিত সহ ধর্ম-বর্ণ জাত নির্বিশেষে কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মানুষ কেমন আছেন, সে ব্যাপারে সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে কি?

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ এবং সংসদে কোনও আলোচনা ছাড়াই আকস্মিকভাবে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা বিলোপ এবং জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নিয়েছিল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। তার পর থেকে দ্বিখণ্ডিত কাশ্মীর সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। জনজীবন সেখানে প্রায় পুরোপুরি কাঁটাতার-বন্দি বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহুবার দেশবাসীকে শুনিয়েছেন তাঁরা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের কবর খুঁড়ে দিয়েছেন। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান এখন তাঁদের হাতের মুঠোয়। প্রধানমন্ত্রী গত এপ্রিলে কাশ্মীরে গিয়ে ফিরিস্তি শুনিয়ে এসেছেন, সেখানকার উন্নতির জন্য তিনি কী কী করেছেন। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও কাশ্মীর কত স্বাভাবিক তা বোঝাতে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। অথচ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ একের পর এক জঙ্গি হামলার শিকার হচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে লিখিতভাবে জানিয়েছিল ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকে ৫৪১টি সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা ঘটেছে। তারা দাবি করেছে এই সময়ে ৪৩৯জন সন্ত্রাসবাদীকে নিরাপত্তাবাহিনী হত্যা করেছে, ১০৯জন সেনা বা পুলিশকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন, সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন ৯৮ জন। এই বিপুল প্রাণহানিই কি কাশ্মীরের স্বাভাবিক পরিস্থিতি? 'কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতি' (কেপিএসএস)-এর হিসাবে ২০১৯ থেকে ২০২২-এর মে পর্যন্ত ৬৪টি সুনির্দিষ্টভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার ঘটনার বিবরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে উপত্যকার হিন্দু, মুসলিম, শিখ সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন।

সাংবাদিকরা দেখিয়েছেন, বদগামের শেখপুরা ট্রানজিট ক্যাম্পের ৩০০ কাশ্মীরী পণ্ডিত পরিবারের বেশিরভাগেরই অভিমত, ১৯৯০-এর পণ্ডিত নিধন এবং তাঁদের গণহারে কাশ্মীর ত্যাগের ঘটনার ক্ষত ধীরে ধীরে মুছেই যেতে বসেছিল। ২০১০-এ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসনের বিশেষ প্যাকেজ অনুসারে কাজ ও আর্থিক অনুদানের আশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা এই ট্রানজিট কলোনিতে এসেছিলেন। সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়ে পণ্ডিত পরিবারগুলির পুরনো জায়গাতেই তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। সময় যত এগিয়েছে তাঁদের অনেকের সাথেই পুরনো প্রতিবেশীদের সংযোগ স্থাপন হয়েছে। ক্যাম্পের আশেপাশের স্থানীয় কাশ্মীরিদের সাথেও তাঁদের আদানপ্রদান স্বাভাবিক হয়েছে। দোকান, বাজার করা থেকে পড়াশোনা সব কিছুতেই হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মেলামেশা গড়ে উঠছিল। এই পণ্ডিতদের অনেকেই শিক্ষকতার পেশায় আছেন। স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের স্কুলের এই শিক্ষকদের ছাড়া নিজেদের জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। তারা অনেকেই প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার জন্যও ট্রানজিট ক্যাম্পের ফ্ল্যাটগুলিতে অবাধে যাতায়াত করত। শ্রীনগরের এক শিক্ষক দম্পতির কথায়, ২০১৬-তে যখন বুরহান ওয়ানির হত্যার পর কাশ্মীর উত্তপ্ত, রোজ যুবকদের সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে। ছররার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তরুণ মুখগুলি যখন মানুষকে আলোড়িত করেছে সেই সময়েও আমরা বিপন্ন বোধ করিনি, বরং সবসময় মুসলিম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শান্তি ও সুরক্ষার আশ্বাসই পেয়েছি। কিন্তু আজ যেন সেই ভরসা পাচ্ছি না (দ্য হিন্দু, ১১ জুন ২০২২)।

অবিশ্বাসের বাতাবরণ বাড়তে শুরু করে ২০১৯-এর ৫ আগস্টের পর থেকে। কাশ্মীরের মানুষের বড় অংশই রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়াকে রাজ্যবাসীর আত্মসম্মানের উপর আঘাত হিসাবে নিয়েছেন। পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝে তখনই এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) বলেছিল, 'এভাবে ৩৭০ ধারা বাতিল শুধু কাশ্মীরের জনগণকেই আরও দূরে ঠেলে দেবে তাই নয়, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকেও বাড়তি শক্তি দেবে' (৬ আগস্ট ২০১৯ কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি)। আজকের কাশ্মীরের পরিস্থিতি সেই বাস্তবকেই আবারও তুলে ধরছে।

গত ১২ মে সরকারি অফিসের মধ্যে ঢুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিরা কাশ্মীরি পণ্ডিত রাহুল ভাটকে হত্যা করার পর আতঙ্ক আরও চেপে বসেছে। এ ছাড়াও খুন হয়েছেন একজন শিক্ষিকা, জম্মু থেকে আসা শ্রমিক, রাজস্থান থেকে কর্মসূত্রে কাশ্মীরে আসা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। এমন খুন ঘটেই চলেছে। পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং সরকারি কর্মচারীরা প্রায়ই বিক্ষোভ দেখিয়ে বলছেন, বিজেপি সরকার বিশ্বাসঘাতক। তাঁদের মতে, শান্তি ফেরা দূরে থাক, পরিস্থিতি ১৯৯০ সালের থেকেও খারাপ। পণ্ডিত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজে যেতে পারছে না, শিক্ষক এবং সরকারি কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রে যেতে ভয় পাচ্ছেন। অনেকে চাকরির পরোয়া না করে কাশ্মীর ছেড়ে পালাচ্ছেন। বাকিরা দাবি তুলেছেন তাঁদের সকলকে কাশ্মীরের বাইরে বদলি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার তাতে নারাজ। কারণ তাহলে জনসমক্ষে প্রমাণ হয়ে যায়, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি নিয়ে বিজেপির পেশি আস্ফালন ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক চমক। এখন জম্মু-কাশ্মীরের রিলিফ কমিশনার বিক্ষুব্ধ হিন্দু পরিবারগুলিকে দার্শনিক উপদেশ দিচ্ছেন, হত্যাকাণ্ডকে 'নিছক দুর্ঘটনা' বলে ভাবুন। যদিও চাপে পড়ে সরকার কিছু কর্মীর বদলির বিষয়ে নড়ে বসেছে। ট্র্যাজেডি হল, ১৯৯০-এ বিজেপি-ঘনিষ্ঠ রাজ্যপাল জগমোহন এবং তাদের সমর্থনে চলা ভিপি সিংহের কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে স্বাভাবিকতা ফেরানোর চেষ্টার পরিবর্তে ব্যস্ত ছিল কাশ্মীরী পণ্ডিতদের দ্রুত ভিটেছাড়া করতে। অথচ তখন একমাত্র জেকেএলএফ-এর মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ছাড়া কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ, যাঁদের বড় অংশই মুসলিম, চাইছিলেন পণ্ডিতদের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করে কাশ্মীরের মাটিতেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করুক সরকার। তাঁদের দাবি ছিল কাশ্মীরের মাটিতে গ্রহণযোগ্য বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে হাঁটুক সরকার। তাঁরা বলেছিলেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের একমাত্র রাস্তা কাশ্মীরের মানুষের আস্থা অর্জন। তার জন্য জীবন-জীবিকা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ সব ক্ষেত্রে সার্বিক উন্নতির সরকারি সদিচ্ছা, সামরিক বাহিনী-পুলিশের বাড়াবাড়ি বন্ধ করা, জঙ্গি দমনের নামে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা থেকে সরকারি বাহিনীগুলিকে বিরত করা, সরকার এবং সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণ কোনও অভিযোগ জানালে তার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সরকারের উদ্যোগ নেওয়া। এই ধরনের কাজগুলির মধ্য দিয়ে কাশ্মীরের মানুষের গণতান্ত্রিক দাবিগুলির সমাধানের বিষয়ে জোর দিলে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও রাজনৈতিক সমাধানের পথ পাওয়া যেত। কিন্তু সে সময় দল হিসাবে বিজেপি ও কেন্দ্রে তাদের সমর্থিত সংযুক্ত মোর্চার সরকার তা চায়নি। বলা বাহুল্য কংগ্রেসও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কোনওদিন চায়নি। বিজেপির তখন লক্ষ্য পণ্ডিতদের উপত্যকা ছাড়াকে প্রচারের বিষয় করে তোলা। যাতে সারা ভারতে মুসলিম বিরোধী জিগির তুলে তারা কংগ্রেসের হাত থেকে হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ানের তকমাটা কেড়ে নিতে পারে। তারা হিসাব কষছিল হিন্দুত্বের স্বঘোষিত ঠিকাদার হতে পারলে দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের গদি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

আর এখন সেই পণ্ডিতদেরই বিপদের মাঝে ঘর ছাড়তে বারণ করছে বিজেপি। কারণ তাতে পরিষ্কার হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র দিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে রঙিন স্বপ্ন তারা ফেরি করছিল, তা ছিল পুরোপুরি মিথ্যা। বাস্তবে কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের শক্তি বাড়ছে। বিজেপি সরকারের অপদার্থতা এবং কাশ্মীর নিয়ে সস্তা রাজনীতির মাশুল গুনছেন কাশ্মীরি জনগণ।

কাশ্মীরি পণ্ডিত সংগঠন কেপিএসএস-এর নেতা সঞ্জয় টিক্কু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কতগুলি কারণকে চিহ্নিত করেছেন, ১) ২০১০ থেকেই ক্রমাগত কাশ্মীরের নাগরিক সমাজের গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা, যা আরও বেড়েছে ২০১৬ থেকে। এখন উপত্যকার বিশিষ্ট নাগরিকরা কোনও বিষয়ে মতামত দিতেই ভয় পান। আশঙ্কায় ভোগেন, সত্য বললেই পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট বা ইউএপিএতে তাঁদের হেনস্তা করা হবে। অথচ এই নাগরিক সমাজের ভূমিকাই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রুখতে এবং উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সমাজে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে বহু বছর। ২) ২০১৯-এর আগস্ট থেকে 'ডান্ডা'র জোরই সরকারের শাসনের একমাত্র পথ দাঁড়িয়েছে। নাগরিক সমাজ এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ পুরোপুরি বন্ধ। তিনি বলেন, সমাজের বিশিষ্টদের পাশাপাশি মসজিদ-মন্দিরগুলিকেও এই কাজে ঠিকমতো লাগাতে পারলে কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বদলে যাবে। ৩) সারা দেশে বিজেপির মুসলিম বিরোধী জিগির, বুলডোজার রাজনীতি, বিজেপি মুখপাত্রদের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কটু কথা ইত্যাদি কাশ্মীরের পক্ষে মারাত্মক হচ্ছে। ৪) কাশ্মীর ফাইলস সিনেমায় সমগ্র কাশ্মীরি মুসলমান সমাজকে জিহাদি হিসাবে দেখানোর ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা এবং ৩৫-এ ধারা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে বহিরাগতদের হাতে রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে যাওয়ার আশঙ্কা। তার সুযোগ নিয়ে 'টিআরএএফ'-এর মতো গোষ্ঠীগুলি কাশ্মীরের বাইরে থেকে আসা শ্রমিক এবং কর্মচারীদের হত্যা করছে। তারা স্থানীয়দের বিপন্নতা বোধে উস্কানি দিতে পারছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা হলেও অন্য যাঁরা আক্রান্ত তাঁদের ব্যাপারটা যেন সরকার ভুলেই যাচ্ছে। ৫) কাশ্মীরের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাও পুরোপুরি বিলুপ্ত। ফলে জনমানসে জমা কোনও বিক্ষোভের আঁচই প্রকাশিত হতে পারছে না। এই চাপা ক্ষোভের বারুদ যে মারাত্মক হতে পারে তা সরকারকে স্মরণ করাচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু শুনবে কে?

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক বিজেপি এবং সংঘ পরিবার তাদের ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সারা দেশে যত বেশি করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি বাড়াচ্ছে কাশ্মীরেও তার বিষময় প্রভাব পড়ছে। তাই গণতান্ত্রিক বোধ সম্পন্ন সমস্ত ভারতবাসীর আজ কর্তব্য কাশ্মীরের সব নাগরিকের স্বার্থেই সে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া এবং কাশ্মীরের জনগণের গণতান্ত্রিক দাবি পূরণে সরকারের সঠিক পদক্ষেপের দাবিকে তুলে ধরা। সাম্প্রদায়িক শক্তির বাড়বাড়ন্ত সারা দেশে ঘটতে দিলে কাশ্মীরের জনগণকে আরও বিচ্ছিন্নতাবাদের কবলে ঠেলে দেওয়া হবে।

(সূত্রঃ দ্য হিন্দু, ১১ জুন ২০২২, আল জাজিরা ২ আগস্ট ২০১১, ফার্স্ট পোস্ট ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর নতুন সদস্য

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ৯ জুলাইয়ের সভায় কমরেড শিশির সরকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

এআইডিএসও-র ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্মেলন

এআইডিএসও-র সপ্তম ঝাড়খণ্ড রাজ্য ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২ জুলাই রাঁচির এসডিএস হলে। রাজ্যের ১৭টি জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা সম্মেলনে পৌঁছান। তাঁদের দাবি, সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল করতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনে অর্জিত স্কলারশিপের অধিকার ছাঁটাই করা চলবে না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশ ক্যাম্প বন্ধ করতে হবে।

সম্মেলনের শুরুতে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। শহিদ বেদিতে মাল্যদানের পর কমরেডস ড্যানিয়েল বানসরিয়ার ও কার্তিক সোম মঞ্চে সম্মেলন শুরু হয়। শিক্ষা ও ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সমর্থনে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন ও প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। কানায় কানায় ভর্তি প্রতিনিধি অধিবেশন উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুমিত রায়। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইডিএসও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সামসুল আলম।

প্রতিনিধি অধিবেশন থেকে কমরেড সমর মাহাতকে সভাপতি ও কমরেড সোহন মাহাতকে সম্পাদক করে ১২০ জনের ঝাড়খণ্ড রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুবার্ষিকী পালন

কলকাতার রাজারহাটে পাশ্চাত্যভাষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ‘লা কাসা দে লোস পলিগ্লোতাস’ (বহুভাষীদের বাড়ি) ২৯ জুন উদযাপন করল কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৪৯তম প্রয়াণ বার্ষিকী। মল্লিকবাজারের কাছে কবির সমাধিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান প্রতিষ্ঠানের প্রধান শুভজিৎ রায়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘কবিগুরু দান্তে’ ‘কপোতাক্ষ নদ’ সহ বিভিন্ন কবিতা ও সনেট আবৃত্তি করে শোনান বহু বিশিষ্ট জন। ছবি আঁকা, পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কবির ১৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিষ্ঠান নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করছে আগামী বছর।

কলকাতার সব রাস্তায়
সাইকেল চালানোর অধিকার দাবি

কলকাতায় ১৭৫টি রাস্তায় সাইকেল চালানো নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য সরকার। পার্ক স্ট্রিট সহ বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ অন্যায়ভাবে সাইকেল আরোহীদের ১০০-১৫০ টাকা করে ফাইন দিতে বাধ্য করছে। এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে ‘সাইকেল আরোহী অধিকার ও জীবিকা রক্ষা কমিটি’। জীবন-জীবিকার অন্যতম বাহন সাইকেল সর্বত্র ব্যবহার করতে দিতে হবে এবং কোনও ফাইন নেওয়া চলবে না— এই দাবিতে ৪ জুলাই কলকাতার যদুবাবুর বাজার থেকে রবীন্দ্রসদন সাউথ ট্রাফিক পুলিশ গার্ডের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করে কমিটি রাস্তা অবরোধ করে। পুলিশ গার্ডের দপ্তরের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন ‘সাইকেল সমাজ’-এর রঘু জানা, এআইডিওয়াইও-র দেবু সাউ, ‘সুইচ অন ফাউন্ডেশন’-এর গার্গী মৈত্র। সভা পরিচালনা করেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রঘুনাথ ভট্টাচার্য ও প্রশান্ত পুরকাইত। কমিটির সভাপতি দুঃখশ্যাম মণ্ডলের নেতৃত্বে চার জনের একটি প্রতিনিধিদল দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন ময়দান থানার পুলিশ আধিকারিকদের হাতে।

জনস্বার্থরক্ষা আন্দোলনের স্মরণীয় চরিত্র
বরুণ বিশ্বাসের আত্মোৎসর্গের এক দশক

এ বছর উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া এলাকায় নারী নির্যাতন-ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের এক দুঃসাহসী চরিত্র আদর্শ প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের আত্মোৎসর্গের এক দশক। তৎকালীন শাসক সিপিএম আমলে সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল সুটিয়া। শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা প্রতিদিন কেউ না কেউ ধর্ষিত হতেন। এলাকার মানুষ ছিল ভয়ে নীরব। সেই নীরবতা ভাঙলেন বরুণ বিশ্বাস। তৈরি করলেন ‘সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চ’। শুরু হল দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক আশ্রিত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সরকার বাধ্য হল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। শুধু নারী সুরক্ষাই নয়, এলাকার গরিব মানুষ এবং দুঃস্থ ছাত্রদের পাশে দাঁড়াতেন বরুণ। এলাকায় ভেড়ি এবং ইটভাটা নিয়ে মাফিয়াদের কার্যকলাপ রুখতে ও বন্যা প্রতিরোধের দাবিতেও আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। ধর্ষিত মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ আজও মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। পাশাপাশি শিক্ষা বাঁচানোর আন্দোলনে ‘সেভ এডুকেশন কমিটি’ এবং জনস্বার্থ রক্ষার আন্দোলনে ‘শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চে’র সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

২০১২ সালের ৫ জুলাই গোবরডাঙা স্টেশনে ভাড়াটে খুনির হাতে খুন হন বরুণ। তাঁর স্মরণে গড়ে ওঠা ‘বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটি’ ৫ জুলাই মিত্র ইনস্টিটিউশনের সামনে ‘বরুণ স্মরণ’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শিক্ষাবিদ ও কমিটির সভানেত্রী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, সহসভাপতি ডাঃ বিজ্ঞান বেরা ও শিক্ষক তপন সামন্ত ছাড়াও মিত্র ইনস্টিটিউশনের (মেন) প্রধান শিক্ষক সহ বহু শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চ, এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি, সেভ এডুকেশন কমিটি ও শোহরত সহ বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠী এবং ফোরামগুলির পক্ষে মাল্যদান করা হয়।

বরুণ স্মরণে ৯ জুলাই ভারত সভা হলে রাজ্য কনভেনশনে (ছবি) বক্তারা বরুণ চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও জেলায় জেলায় তা ছড়িয়ে দেওয়ার উপর জোর দেন। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন সাংসদ, বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ তরুণ মণ্ডল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও পরিবেশকর্মী সুকুমার পয়রা, বরুণ বিশ্বাসের সহকর্মী মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন শিক্ষক নাট্যকর্মী বিপ্লব নাহা বিশ্বাস, ‘সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের’ সভাপতি ননীগোপাল পোদ্দার, নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটির অধ্যাপক তরুণ দাস, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র প্রমুখ। কনভেনশনে বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও বাচিকশিল্পীরা সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

কনভেনশন থেকে ৭০ জনের একটি রাজ্যস্তরীয় কমিটি গঠিত হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, দুই মেদিনীপুর, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বরুণ বিশ্বাস স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ৫ জুলাই বরুণ বিশ্বাস স্মরণে নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

বাইক-ট্যাক্সি চালকদের বিক্ষোভ

হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় কিছু অসাধু ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে স্বীকৃত বাইক-ট্যাক্সি চালক এবং যাত্রীদের ওপর নানা ভাবে জুলুম করে টাকা আদায় করছিল। এর প্রতিবাদে ৪ জুলাই ‘কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়ন’-এর উদ্যোগে দুই-শতাধিক বাইক ট্যাক্সি চালক হাওড়া পোস্টঅফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান ও গোলাবাড়ি থানায় ডেপুটেশন দেন। সংগঠনের সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে তিন জনের একটি প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন।

এসিপি, হাওড়া নর্থ ডিভিশন সহ হাওড়া ট্র্যাফিক গার্ডের আই সি, গোলাবাড়ি থানার আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। তাঁরা সমস্যা সমাধানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তোলাবাজি রুখতে বাইক-ট্যাক্সি চালকদের নির্দিষ্ট এলাকায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

পাঠকের মতামত

সেদিন মাথা উঁচু করে জেল ভরেছি আমরা

আইনের কাজ কী? মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া, সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। জনগণের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার কথা নাকি আইনের? কিন্তু দেশ ও রাজ্যের যা পরিস্থিতি, তাতে প্রশ্ন জাগে— সরকারি আইন কি আদৌ জনতার স্বার্থে কাজ করছে?

এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে, নার্স নিয়োগেও দুর্নীতি ধরা পড়েছে। অথচ উপযুক্ত দ্রুততায় তদন্ত শেষ করে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। ধর্মের নামে চলছে সাম্প্রদায়িক হানাহানি। জ্বালানি-ভোজ্য তেল-রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের জীবন জেরবার। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে শিক্ষার বেসরকারিকরণে ইন্ধন জোগানো, দুয়ারে মদ প্রকল্পের নামে মাদক দ্রব্যের ঢালাও ব্যবসা, নারী নির্যাতনের সংখ্যা এবং ভয়াবহতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই যখন সমাজের বাস্তব চিত্র, তখন আইনকে আর জনগণের প্রতি সুবিচারের পন্থা বলা যায় কি? যে আইন দিনমজুরের পেটের ভাত কেড়ে নেয়, মানুষকে নেশাচ্ছন্ন করে অমানুষে পরিণত করে, হৃদয়বৃত্তি ভুলিয়ে প্রবৃত্তির দাস বানায়, ছাত্রের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেয়, মা-বোনদের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়—সে আইনের প্রয়োজন কোথায়? কার্যকারিতাই বা কী? এই প্রশ্নগুলো তুলে ধরতে গত ২৯ জুন গণ আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এসইউসিআই(সি)।

ইতিহাসের পাতায় আইন অমান্য আন্দোলনের কথা পড়া আর নিজে সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে ওঠার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হিসেবে বাবা-মা বরাবর চাইতেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে। বাবা মনে মনে বামপন্থী আদর্শ সমর্থন করলেও পূর্ববর্তী চৌত্রিশ বছর সিপিএম শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তৃণমূল ও বিজেপি সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে আস্থা হারিয়েছেন। রাজনীতি সম্পর্কে ভুল ধারণা বহুদিন যাবৎ আমার মধ্যেও কাজ করেছে, তবে সে ভুল ভেঙে গেছে এসইউসিআই (সি) দলের সংস্পর্শে এসে। বছর দুই হল, এই দলের নেতা-কর্মীরা আমায় পরিবারের মতো আগলে রেখেছেন। এঁদের মধ্যে পেয়েছি স্বজনের ভালবাসা, আন্তরিকতার ছোঁয়া। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এই আইন অমান্যের কথা যখন শুনলাম, আমি পিছিয়ে থাকতে পারিনি।

চোখের সামনে দেখেছি, ২৯-এর আইন অমান্যের জন্য দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেছেন দলের কর্মীরা। দেওয়াল লিখেছেন, বাসে ট্রেনে-বাজারে-পাড়ার মোড়ে মাইক, হ্যান্ডবিল নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন পার্টির বক্তব্য, আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছেন। মানুষ সাগ্রহে সমর্থন করেছেন দাবিগুলো। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে, সিপিএম আমলে চাকরির নিয়োগে যে স্বজনপোষণ, দলবাজি চলত, তার পরিবর্তন হওয়া দূরে থাক, তৃণমূল আমলে তা আরও নগ্ন আকার নিয়েছে। অন্যদিকে দেশের যাবতীয় সরকারি সম্পত্তি পুঁজিমালিকদের কাছে বেচে দিয়ে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। একটা বিরাট অংশের সাধারণ মানুষ তাই সমর্থন করেছেন আন্দোলন, সাধ্যমতো সাহায্য করেছেন তহবিলে। কর্মীদের প্রচার কর্মসূচিতে বহু মানুষ বলেছেন, 'একমাত্র এই পার্টিটাই আজও সাধারণ মানুষের জন্য লড়াই আন্দোলন করে'। দিনের শেষে আপামর জনতার এই ভালোবাসাই পরিশ্রম করার শক্তি, বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে।

অবশেষে এল ২৯ জুন। মৌলালির কাছে রামলীলা পার্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত প্রত্যন্ত থেকে আসা হাজার হাজার মানুষের বিশাল জনসমাবেশ ঘিরে প্রথম থেকেই দেখলাম বিরাট পুলিশি প্রহরা। মিছিল শুরু হল দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের বক্তব্য দিয়ে। তরুণ প্রজন্মের কাছে ভয়, দুর্বলতা জয় করে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখলেন তিনি। মৌলালি থেকে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে মিছিল এগোচ্ছিল ধর্মতলা অভিমুখে, হাজার হাজার মানুষের সম্মিলিত স্লোগানে কাঁপছিল মহানগরীর রাজপথ। আমার মেসবাড়ির নতুন সদস্যদেরও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আবেগের শরিক হয়ে তারাও মিছিলে হেঁটেছে। হঠাৎ শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশ, শুরু হল লাঠিচার্জ। দেখলাম, পুলিশের লাঠির সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে কাতারে কাতারে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রমিক, ডাক্তার, আইনজীবী। জাত নেই, ধর্ম নেই, পেশা নেই—একদিকে আছে শোষিত-বঞ্চিত মানুষ আর অন্যদিকে উন্মত্ত মালিকের পোষা পুলিশ বাহিনী। কেউ পালাচ্ছে না। সবার মুখে এক স্লোগান—আইন ভাঙো, জেল ভরো। দেখলাম, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলার ডাক দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এগিয়ে চলেছে জনজোয়ার, ভেঙে পড়ছে ব্যারিকেডের অহঙ্কার। পুলিশ তখন আরও উগ্র মূর্তি ধারণ করেছে। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কমরেডদের, অনেকে আহত হচ্ছেন। তবু ময়দান ছেড়ে পালাইনি আমরা। ভীরুর মতো পিছন ফিরে নয়, পুলিশের চোখে চোখ রেখে ভরেছি প্রিজন ভ্যান।

জীবনে যে মেয়ে কোনও দিন বাবা-মা'র স্নেহচ্ছায়া ছেড়ে সক্রিয় রাজনীতি করবে বলে ভাবেইনি, সে প্রথম বার দাঁড়াল পুলিশি বর্বরতার মুখোমুখি। পুলিশের লাঠি খেল, বিরোধিতা করল পুলিশের অশালীন মন্তব্যের। রাজনৈতিক বন্দীদের অত্যাচার করার অধিকার পুলিশের নেই। তবু রাজ্য সরকারের পুলিশ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মোকাবিলা করল লাঠি দিয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দৈহিক আক্রমণ করে। প্রায় একশো জনকে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) কর্মীদের মনোবল, তেজ এতটুকু টলাতে পারেনি ওরা। মাথা উঁচু করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলতে বলতে আমরা লালবাজারের লক আপ ভরিয়ে ফেললাম। হাসি মুখে সবাই মিলে গাইলাম 'বাঁধ ভেঙে দাও', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। এই প্রথম আমি দেখলাম এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের আন্দোলন, যেখানে বাবা-ছেলে-মা-মেয়ে একসাথে গ্রেপ্তার বরণ করলেন। এই প্রথম দেখলাম, কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মী নিজের সন্তানকে আড়াল না করে তাকেও এগিয়ে দিচ্ছেন গণ আন্দোলনে। রক্তের সম্পর্ক ছাপিয়ে আমরা সবাই তখন সংগ্রামের সাথী—'কমরেড'।

প্রিয়াঙ্কা চ্যাটার্জী
কলকাতা - ৭০০ ০১৩

দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই

দুয়ের পাতার পর

তহবিলে বিপুল টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও, এই সরকার কাজের কাজ কিছুই করেনি। বাস্তবে, নারী নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এতটাই উদাসীন যে, বছরের পর বছর এই তহবিলের টাকা ঠিকমতো ব্যবহার পর্যন্ত করা হয় না। ফলে কলে-কারখানায়, অফিস-কাছারিতে বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত কাজের জায়গাগুলিতে যৌন হেনস্তা রোখার আইনটি যাতে যথাযথ রূপায়িত হয়, সরকার তা দেখবে— এ কথা ভাবাই যায় না। সন্তানের দেখভালের জন্য সরকারের উদ্যোগে ক্রেশ কিংবা বেতনবৈষম্য রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া তো দূর অস্ত। পাশাপাশি রয়েছে এ দেশের ভয়ানক বেকার সমস্যা এবং চরম গরিবির কারণে শিক্ষার জগৎ থেকে মেয়েদের ক্রমে আরও বেশি করে দূরে সরে যাওয়া। এই পরিস্থিতিতে কাজের জগতে মহিলাদের অংশগ্রহণ কমে যাওয়ারই কথা এবং হচ্ছেও তাই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির তাকালেও একই ছবি নজরে পড়ে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, কাজ করতে সক্ষম পাঁচজন নারীর মধ্যে এ রাজ্যে চারজনই কর্মহীন। রাজ্যের প্রধান প্রশাসক হিসাবে মাসে মাসে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা খয়রাতি করেই মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব সারছেন। যেখানে প্রয়োজন ছিল মেয়েদের আরও বেশি করে শিক্ষার আঙিনায় টেনে আনার ব্যবস্থা করা, সেখানে দেখা যাচ্ছে নাবালিকা বিবাহের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। ভারতে গড়ে ২৫ শতাংশ নাবালিকা কন্যার বিবাহ হয়, পশ্চিমবঙ্গে সেই হার ৪২ শতাংশ।

ভারতের সমাজে নারীর এমন বিপন্ন অবস্থানের নিরিখে কাজের জগতে মহিলাদের ক্রমাগত কমতে থাকা সংখ্যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কিন্তু এই পরিস্থিতি পরিবর্তনে যা দরকার, সে সবের ব্যবস্থা করা দূরের কথা, বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্য— কোনও সরকারেরই কোনও উদ্বেগ পর্যন্ত লক্ষ করা যাচ্ছে না। ফলে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, জ্যোতিবারাও ফুলে সহ নবজাগরণের মনীষীদের দেখানো পথে এই পরিস্থিতি দূর করতে উদ্যোগী হতে হবে সমস্ত স্তরের সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে। আন্দোলনের চাপে সরকারগুলিকে বাধ্য করতে হবে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও রূপায়ণে।

গ্রামে-শহরে মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি রয়েছে, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ধ করতে হবে নাবালিকা বিবাহ। সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও সমমর্যাদা সম্পর্কে চেতনা জাগানোর কাজে পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে নারীদেরও। এই পথেই কাজের জগতে ক্রমে বাড়ানো যাবে মহিলাদের অংশগ্রহণ, সমাজে পূর্ণ মানুষের মতো মাথা উঁচু করতে বাঁচতে যা খুবই প্রয়োজনীয়।

হরিয়ানায় সরকারি শিক্ষা ধ্বংসে বিজেপির নয়া ষড়যন্ত্র

হরিয়ানার বিজেপি সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে 'চিরাগ যোজনা' নামে নতুন প্রকল্প চালু করতে চলেছে। এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করা ও বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকার নিজেই পালন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

একে সরকারি শিক্ষা ধ্বংসের নীল-নক্সা আখ্যা দিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইডিএসও-র হরিয়ানা রাজ্য কমিটি। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি হরীশ কুমার এ প্রসঙ্গে বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারি মালিকদের মুনাফার পণ্যে পরিণত করতে চাইছে হরিয়ানার বিজেপি সরকার। সেই উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক প্রকল্প চালু করছে। 'চিরাগ যোজনা' তেমনই একটি প্রকল্প। এর মধ্য দিয়ে সরকার ধীরে ধীরে বিনামূল্যে সর্বজনীন শিক্ষার দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে।

এর প্রতিবাদ জানিয়ে এআইডিএসও-র হরিয়ানা রাজ্য কমিটি দাবি করেছে, অবিলম্বে সমস্ত সরকারি স্কুলের খালি পড়ে থাকা পদ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে পূর্ণ করতে হবে। বিনামূল্যে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে সরকারকে অবিলম্বে স্কুলবাড়ি, আসবাব, লাইব্রেরি, পানীয় জল ও শৌচাগারের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে সরকারি স্কুলগুলিতে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হঠাৎ ইতিহাস লিখতে ব্যগ্র কেন

সম্প্রতি রাজপুতানার ইতিহাস সম্পর্কিত একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ভারতের অধিকাংশ ইতিহাসবিদ পাণ্ড্য, চোল, মৌর্য, গুপ্ত সহ বহু সাম্রাজ্যের গৌরবময় কাহিনিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র মুঘলদের ইতিহাস চর্চা করেছেন ও প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি সুলতান ও মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধে রাজপুতানা, অহম (আসাম) সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের রাজাদের লড়াইকে সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্ম রক্ষার যুদ্ধ বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, এখন সত্য ইতিহাস লেখা থেকে কেউ আর আমাদের আটকাতে পারবে না, আমরা এখন স্বাধীন। আমরা আমাদের ইতিহাস নিজেদের মতো লিখতে পারি।

ইতিহাস সম্পর্কে শাহের মন্তব্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। সত্যই কি তিনি স্কুল-কলেজের সিলেবাসে মৌর্য, গুপ্ত, চোল, পাণ্ড্য, সাতবাহন প্রমুখ আঞ্চলিক রাজাদের ইতিহাস খুঁজে পাননি? না কি খুঁজে দেখার চেষ্টা করেননি? অথবা দেখেও না দেখার ভান করেছেন? তাঁর মতে স্কুল ও স্নাতক স্তরের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে কেবলই মুঘলদের ইতিহাস পড়ানো হয়। ইতিহাসবিদ ও গবেষকগণ নাকি তাঁদের গবেষণায় গুরুত্ব দিয়েছেন মুঘল রাজাদের।

বাস্তবে মন্ত্রীমশাই একটু সময় খরচ করে পাঠ্যসূচির দিকে তাকালেই দেখতে পেতেন, দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে মুঘলরা কেবল সাড়ে তিনশো বছর রাজত্ব করেছেন। বাকি সময়ে কারা রাজত্ব করেছেন সে প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তিনি নিজেই দিয়েছেন— মৌর্য, গুপ্ত, মৌখরি, পাল, সেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করেছে। ইতিহাসবিদদের গবেষণায় তাদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এই বংশগুলি নিয়ে গবেষণা হয়নি, ইতিহাসবিদরা গুরুত্ব দেননি এ-ও সঠিক তথ্য নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে এবং তাঁর বিভাগের কর্তাদের দিয়ে একটু খোঁজ নিলে দেখতে পেতেন, দেশের খ্যাতিমান গবেষকরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজবংশ ও তাদের সংস্কৃতি নিয়ে কত বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ কে এ নীলকান্ত শাস্ত্রী, কে ভ্যালুথাট সহ বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ গবেষক দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ চর্চা করেছেন। একই ভাবে মুঘল পূর্ববর্তী প্রাচীন ভারতের ও আদি মধ্যযুগ নিয়ে এইচ সি রায়চৌধুরী, এ এল ব্যাসাম, আর এস শর্মা, রাধাকুমুদ মুখার্জি ও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতো ইতিহাসবিদরা মৌলিক ইতিহাস চর্চা করে গিয়েছেন। নতুন নতুন তথ্যের আলোকে রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিবের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদরা ওই সময়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নিত্যনতুন তথ্যের আলোকে শ্রমসাধ্য পরিশ্রম করে গবেষকরা যে কাজ করে চলেছেন তাতে বহু অজানা বিষয়, অজানা কাহিনীর আবরণ উন্মোচিত হচ্ছে।

মুক্ত মনে ইতিহাস পাঠ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে, মৌর্য, গুপ্ত, চোল, পাণ্ড্য, পল্লব ইত্যাদি বিভিন্ন বংশের রাজত্বের সময়কালে বড় রাজ্য এবং ছোট রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থেকেছে। আবার সুলতানি ও মুঘল শাসকদের বিরুদ্ধেও আঞ্চলিক রাজাদের লড়াই হয়েছে। কিন্তু এতে কখনও সংস্কৃতি, ভাষা বা ধর্ম রক্ষার লড়াই যুক্ত ছিল না। ছিল না কোনও আদর্শগত সংঘাতের প্রশ্নও। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। যদি আদর্শের সংঘাত হত, তাহলে আকবরের বিরুদ্ধে সংঘাতে রানা প্রতাপের সেনাপতি হাকিম খান সুর হতেন না, কিংবা আকবরের সেনাপতি মানসিংহ হতেন না। শিবাজি তার সেক্রেটারি হিসেবে মৌলবি হায়দার খানকে নিয়োগ করতেন না। ঔরঙ্গজেব তার সেনাপতি হিসেবে জয়সিংহকে নিয়ে আসতেন না। ওই সময়ের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসচর্চা প্রমাণ দেয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন নিয়েই উভয়ের সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

যদি তথ্যভিত্তিক প্রশাসনিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাসের চর্চা করা যায় তা হলে দেখা যাবে, এইসব ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি সম্প্রদায়ভিত্তিক ছিল না। একই ভাবে সেদিন সংস্কৃতির সংহতির ক্ষেত্রে ঐকতানের সুরই লক্ষ করা গিয়েছিল। সঙ্গীত যন্ত্র এসরাজ, সুরবাহার, সারেঙ্গি হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার ফসল ছিল। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির ইতিহাস যদি বর্তমান শাসকরা খুঁজে দেখতেন তাহলে জানতে পারতেন এগুলির সৃষ্টির পেছনে খসরু থেকে তানসেনদের কী অবদান ছিল। সৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। ইতিহাসের প্রবহমান ধারায় নামী-দামি বহু সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে। সমাজ-সংস্কৃতির অগ্রগতির ধারায় যা মহত্তম অবদান রেখে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের সেই ঘটনাগুলি মানুষ মনে রেখেছে, চর্চাও হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশে যে সার্বিক সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা ছেড়ে মন্ত্রীমশাই হঠাৎ করে ইতিহাস নিয়ে পড়লেন কেন? এখানেও কি সেই পেশিশক্তির আস্ফালন? আসলে এ হল, প্রসঙ্গ সামনে এনে সমস্যা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর কৌশল মাত্র। এই কৌশলের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফসল হয়ে উঠেছে ইতিহাস। বিজেপি নেতাদের লক্ষ্য, দেশের নাগরিকরা যেন তাঁদের কাছ থেকেই ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারণাগুলি গ্রহণ করে। তাই তাঁরা দেশের ইতিহাসের মৌলিক পরিবর্তন করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কোনও প্রকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, প্রতিবাদের তোয়াক্কা না করে ইউজিসিকে দিয়ে সুকৌশলে দেশের ইতিহাস বদলে ফেলতে চাইছেন। এই ক্ষেত্রে তাদের দুই অস্ত্র হল ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এবং ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি। তাদের তৈরি করা ধাঁচে ইতিহাস নির্মাণ হলে দেশের ছাত্রছাত্রীরা জানতেই পারবেন না, এদেশে একদিন হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর মতো সভ্যতা ছিল। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের মতো প্রতিবাদী ধর্মের উত্থান ঘটেছিল। ১২০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রথমে সুলতানি সাম্রাজ্য পরে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে মৌর্য, গুপ্ত, চোল, পাণ্ড্য ও সাতবাহন প্রভৃতি আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির কোনও তুলনা চলতে পারে না। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে কাঠামো মুঘলরা নির্মাণ করতে পেরেছিল তার কোনও তুলনা সমকালীন আঞ্চলিক রাজশক্তিগুলির সঙ্গে করা চলে না।

তাদের মনগড়া ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর ইতিহাসের বদলে তথ্যবিকৃতির ইতিহাস তৈরি করা হচ্ছে। তারা যে হিন্দু ধর্মভিত্তিক ইতিহাস নির্মাণ করতে চান তা তাদের প্রকাশিত কলেজ স্তরের ইতিহাসের সিলেবাস দেখলেই অনুধাবন করা যায়। বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব, ভূখণ্ডের আদি বাসিন্দা নির্ধারণ, হিন্দু ধর্মের উৎপত্তির গরিমা কীর্তন, সংস্কৃত ভাষার চর্চাকে প্রাধান্য দেওয়া আসলে হিন্দু ধর্মভিত্তিক ইতিহাস নির্মাণের পথ। তথ্য-প্রমাণ ও যুক্তির মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস যেভাবে এতদিন ধরে নির্মাণ করা হয়েছে তার বদল করে ধর্মীয় ভেদাভেদ জাতপাতভিত্তিক কল্পিত ইতিহাস নির্মাণ করে ক্ষমতার জোরে তাকেই প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা বলে চালাতে চাইছে। শাসক কর্তৃক ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা তথ্যনির্ভর বস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস চর্চার পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের এই ধরনের ব্যাখ্যায় একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর একটি সম্প্রদায়ের ক্ষোভ জন্ম নেবে ও সম্প্রীতির বাতাবরণ নষ্ট হবে।

বিপুল মুনাফাতেই অগ্নিমূল্য

একের পাতার পর

করার সময়ে বলা হয়েছিল, নগদে দাম বাড়লেও গ্রাহকদের অসুবিধা হবে না। কারণ বাড়তি দামটা ভরতুকি হিসাবে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এটা কি দেশের মানুষের সঙ্গে নির্লজ্জ প্রতারণা নয়?

সরকার এমন একটি সময়ে অত্যাবশ্যকীয় জ্বালানি হিসাবে গ্যাসের দাম বাড়াল যখন লকডাউনে কাজ হারিয়ে বিরাট অংশের মানুষের রোজগার তলানিতে চলে গেছে। মানুষ দু'বেলা কী খাবে, তা-ই ভেবে পাচ্ছে না। তার উপর গ্যাসের লাগাতার দামবৃদ্ধি মানুষের উপর ভারী বোঝা হিসাবে নেমে এসেছে। তেলমন্ত্রী বলেছেন, গ্যাসে ভরতুকির আশা আর না করাই ভাল। অথচ সরকার দেশের শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের দেদার ভরতুকি দিয়ে চলেছে। মন্ত্রীর এই 'জ্ঞানবাণী' শুধুমাত্র দরিদ্র-সাধারণ মানুষের বেলায়। তাই তেল কোম্পানিগুলি রাশিয়া থেকে জলের দামে অশোধিত তেল কিনে সীমাহীন মুনাফা করলেও তার কোনও সুবিধা দেশের মানুষ পায় না। লকডাউনে মানুষ কাজ হারিয়ে যখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটিয়েছে তখনও তেল কোম্পানিগুলি আস্বাভাবিক পরিমাণে লাভ করেছে। অন্য দিকে তেলমন্ত্রী তাদের লোকসানের মিথ্যে গল্প দেশের মানুষকে শুনিয়ে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই সরকার তা হলে কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে? জনগণকে চরম দুরবস্থার দিকে ঠেলে দিয়ে শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখে যে সরকার, আর যা-ই হোক তাকে জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার বলা যায় না। প্রশ্ন হল, ভর্তুকি কেন দেওয়া হয়? দেওয়া হয় এই কারণে যে, দেশের বিরাট অংশের মানুষ দরিদ্র, আর্থিক ভাবে দুর্বল। খাদ্য, জ্বালানি প্রভৃতি প্রয়োজনে যদি সরকার তাদের পাশে না দাঁড়ায় তবে তাদের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। সেই অবস্থায় মানুষকে খানিক সুরাহা দিয়ে জনবিক্ষোভ স্তিমিত করার লক্ষ্যেই ভর্তুকির প্রচলন হয়েছিল। তা ছাড়া আর একটি বিষয়ও ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জনস্বার্থে যে ভূমিকা নিত, তার ছিটেফোঁটাও যদি পুঁজিবাদী দেশগুলি না নেয়—তা হলে এই সব দেশের মানুষের সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকার সম্ভাবনা ছিল। এটা আটকানোও ছিল ভর্তুকি প্রচলনের আর একটি কারণ। তা হলে সেই ভর্তুকি আজ উঠে যাচ্ছে কেন?

প্রথম কারণ, পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট। বাজার সঙ্কট। এই সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে হলেও মুক্তি পেতে যে বিশ্বায়ন উদারিকরণের নীতি বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলি গ্রহণ করে ১৯৯০-এর দশকে, তারই অন্যতম শর্ত ছিল ভরতুকি কমাও, পারলে বন্ধ কর কিন্তু ত্রাণ প্যাকেজের নামে পুঁজিপতিদের যথেচ্ছ ভরতুকি দিয়ে তাদের সীমাহীন মুনাফার ব্যবস্থা করে দাও। এই ফর্মুলাই মেনে চলেছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকার। এখন মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার আরও প্রবল ভাবে তা কার্যকর করছে।

দ্বিতীয় কারণ, গণআন্দোলনের বিশেষ করে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা। শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা। এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকার, বিশ্বায়নের সুফল নিতে হবে, সব কিছুর ভাল দিক আছে, খারাপ দিক আছে — এ'সব বলে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে শ্রমজীবী মানুষের কাছে সহনীয় করার চেষ্টা করেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ তার বাজার সঙ্কটের হাত থেকে সাময়িকভাবে মুক্তির জন্য যে স্কিম এনেছে, তা যে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে নয়, তার স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়ে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে প্রস্তুত করার কাজটি তারা কৌশলে এড়িয়ে গেছে। প্রধানত এই দুটি কারণের জন্যই সরকার বেপরওয়া ভাবে জনস্বার্থে ভরতুকি কমাতে পারছে।

কিন্তু পেট বড় বালাই। তাই প্রতারিত মানুষ রাস্তায় নামবেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার সাথে গ্যাসের দাম হাজার ছাড়িয়ে পরিস্থিতিকে সেই দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে আর চুপ করে থাকা নয়। পথে ঘাটে বাসে ট্রেনে চায়ের দোকানে সর্বত্র সরকারের এই জনবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। প্রতিবাদে মুখর হতে হবে। সামিল হতে হবে প্রতিবাদী আন্দোলনে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার স্মরণসভা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য, জয়নগরের ৭ বারের বিধায়ক বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ময়দানে। বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে মাঠ উপচে আশপাশের এলাকা ভরে যায়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একের পর এক মৃত্যু

অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি অ্যাবেকার

বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাটিতে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুৎবাহী তার কিংবা অসুরক্ষিত বাতিস্তম্ভের সংস্পর্শে আসার ফলে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে।

২৭ জুন কলকাতার হরিদেবপুরে ১১ বছরের এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার পাঁচ জনের এক প্রতিনিধিদল মৃতের বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানান। স্থানীয় থানা ও কাউন্সিলারের কাছে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও লাইন মেরামতির দাবি জানান তাঁরা।

পর দিন বাঁকুড়ার ঝাঁটিপাহাড়ীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে অ্যাবেকার এক সদস্য প্রাণ হারালে সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে বাঁশের খুঁটিতে বিদ্যুতের তার পরিবহণের প্রতিবাদ জানান।

২ জুলাই বাঁকুড়া শহরের ভূতেশ্বর গ্রামে রাস্তায় মাটিতে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুৎবাহী তারে গৃহবধূ পার্বতী ঘোষ এবং স্থানীয় বিদ্যুৎ গ্রাহক অনঙ্গমোহন ঘোষ মারা যান। গ্রাহক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরিবারগুলোর সাথে দেখা করেন। স্থানীয় প্রশাসন মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।

ওই দিনই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দক্ষিণ গঙ্গারামপুরে ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যান সুব্রত মণ্ডল। অ্যাবেকার প্রতিনিধিরা উলুবেড়িয়ায় বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিভিশনাল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পরিষেবার সঠিক মানের দাবি জানান।

ওই দিনই কলকাতার রাজাবাজারে বৃষ্টির জমা জলে বাতিস্তম্ভের সংস্পর্শে এসে ১৩ বছরের ছাত্র মহম্মদ ফারজান আনসারির মৃত্যুর খবর পেয়ে অ্যাবেকার এক প্রতিনিধিদল মৃত ছাত্রের পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানান।

ধারাবাহিক ভাবে ঘটে চলা এই ধরনের দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাসের নেতৃত্বে সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটি ৫ জুলাই কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র-ইন-কাউন্সিল, লাইটিং অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি এবং সিইএসসি কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। মেয়র-ইন-কাউন্সিল দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

অ্যাবেকা কলকাতা জেলা সভাপতি শিবাজী দে-র নেতৃত্বে জেলা সম্পাদক নীরেন কর্মকার, আশীষ দণ্ড ওই দিনই সিইএসসির সদর দপ্তরে স্মারকলিপি দিলে কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ ও নজরদারির ত্রুটির কথা স্বীকার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

আন্দোলনের চাপে মালদায় মোটরভ্যান চালানোর অধিকার আদায়

২৩ জুন মালদা ট্রাফিক পুলিশ ৪১টি মোটরভ্যান আটক করে এবং প্রশাসন জানিয়ে দেয় জেলায় মোটরভ্যান নিষিদ্ধ। খবর পেয়েই এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নেতৃত্বে শতাধিক মোটরভ্যান চালক ডি এস পি (ট্রাফিক) এর কাছে গেলে তিনি বলেন, মালদা জেলায় মোটরভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঔদ্ধত্যের সাথে তিনি বলেন, ধরপাকড় চলতে থাকবে এবং বুলডোজার দিয়ে ভ্যান ভেঙে দেওয়া হবে।

মোটরভ্যান চালকেরা প্রশাসনের এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন। সারা জেলার মোটরভ্যান চালকেরা মাইকে ও রাস্তায় দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রচার করেন এবং কমিটি করে প্রশাসনের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মোটরভ্যান বন্ধ হয়ে গেলে জেলার প্রায় দশ হাজার যুবক কর্মহীন হয়ে পড়বেন, বিরাট সংখ্যার গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন— চালকদের বক্তব্যের এই আকুতি জেলার মানুষকেও নাড়া দেয়।

শেষে ৪ জুলাই চার সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক প্রশাসনের হুমকি অমান্য করে মালদা শহরে মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। মোটরভ্যান চালকদের এই অনমনীয় মনোভাবের সামনে পড়ে প্রশাসন বাধ্য হয় আটক মোটরভ্যান ছেড়ে দিতে। ভবিষ্যতে জেলায় আর ধরপাকড় হবে না বলে প্রতিশ্রুতিও দেয় তারা।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি এবং এআইইউটিইউসি রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দীপক চৌধুরী, জেলা সভাপতি কমরেড অংশুধর মণ্ডল ও সম্পাদক কমরেড কার্তিক বর্মন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com